অমর একুশে
শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫

◆ বিশেষ ক্রোড়পত্র ◆ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সার্বিক তত্ত্বাবধান : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
০৮ ফাল্গুন ১৪৩১

বাণী

মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আমি বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা-ভাষী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ইউনেস্কো ২০০০ সাল থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে আসছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- "Make languages count for sustainable development" যুক্তিযুক্ত হয়েছে ।

শত বছরের শোষণে ও শাসনে জর্জরিত বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের প্রথম জয়যাত্রা ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিতে। বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ভাষা-ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল। এ দিনে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা'র মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিক উদ্দিন আহমদ, শফিউর রহমানসহ আরও অনেকে।

১৯৫৬ সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায় এবং ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এই দিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে ।

জুলাই-গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ ও দেশের ভাষাসমূহের মর্যাদা রক্ষায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, যা দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতেও সরকার কাজ করছে। এছাড়াও, ব্রেইল বইসহ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

সবাইকে মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ এর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই । এ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

একুশে ফেব্রুয়ারি এবং নতুন বাংলাদেশ গঠনে আমাদের করণীয়

অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম

১

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় যে ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তার পেছনে আগের অন্তত পাঁচ বছরের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তৎপরতার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। একুশে ফেব্রুয়ারির কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অংশগ্রহণের বিস্তারিত দলিল পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশের গণমানুষের, অন্তত বিপুল মধ্যবিত্তের, সক্রিয়তা ও সমর্থনের ভিত্তিতে এ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। বদরুদ্দীন উমর *ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* বইয়ের তিন খণ্ডে ওই আন্দোলনের বিস্তারিত পটভূমি পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তুলে ধরেছেন। তার ভিত্তিতে বলা যায়, একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা আসলে এই জনগোষ্ঠীর বিচিত্র রাজনৈতিক চেতনা ও বাস্তবের ঘনীভূত প্রকাশ।

ভাষা আন্দোলন ত্বরিত সাফল্য পেয়েছিল। চুয়ান্নর নির্বাচনে বাংলা ভাষা হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক দাবির প্রধান উপাদান। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানেই বাংলা স্বীকৃত হয়েছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। পরে স্বাধিকার আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের অন্যরকম পুনরুজ্জীবন ঘটে। ষাটের সাংস্কৃতিক রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহে বাংলা হয়ে ওঠে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার সাংবিধানিক স্বীকৃতি তাই কোনো নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপার ছিল না। আগের দুই দশকের ধারাবাহিকতায় এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য ছিল।

২

ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা ভাষার হালচাল নিয়ে অনেককেই উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়। এটা খারাপ না। এই উদ্বেগের দরকার আছে। বাংলাদেশে বাংলা ভাষার বিপর্যস্ত অবস্থাটা খালি চোখে দেখা যায় না। কানে শুনেও মালুম হয় না। কারণ, এই জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে একভাষী। ফলে সর্বত্র বাংলা কথা শোনা যায়। কিন্তু ভাষার ব্যবহারের যেগুলো কার্যকর ও অভিজাত এলাকা – শিক্ষা, আইন ও অফিস আদালত – সেগুলোতে বাংলার অবস্থা এত শোচনীয় যে, উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। ফলে যাঁরা অন্তত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা ভাষার ব্যাপারে সচেতন হন, তাঁদের প্রশংসা করতে হয়।

আজকাল বাংলা ভাষাপ্রশ্নে সাধারণত দুই ধরনের উদ্বেগের কথা শোনা যায়। এক. 'শুদ্ধ' বাংলার চর্চা বেশ কমে গেছে। বিশেষত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাঁরা লেখেন, তাঁদের ভাষায় সচেতনতা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। দুই. লোকে ইংরেজি ব্যবহার করতে পছন্দ করে; এমনকি বাংলা বলার সময়েও দেদার ইংরেজি শব্দ মেশায়। আমরা এ লেখায় প্রস্তাব করছি, এই উদ্বেগ 'নকল' উদ্বেগ। অন্তত কাজের উদ্বেগ নয়।

'নকল' বলার মূল কারণ, এ দুটোই আসলে আমাদের ভাষা-ব্যবহারের অন্য দশ কর্মকাণ্ডের ফল মাত্র। ফলে ওই কর্মকাণ্ডের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ না করে 'ভাষাদূষণ' ও 'ভাষা-মিশ্রণ' নিয়ে যদি কথা বলা হয়, এবং একেই যদি দায়িত্ব-পালন ভাবা হয়, তাহলে তাকে নকল না বলে উপায় নাই।

লোকে সামাজিক ব্যবহারে কোন ভাষায় অভ্যস্ত হবে তা নির্ভর করে প্রধানত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সে কোন ভাষা পড়ছে তার উপর। প্রথম ভাষা মানুষ শেখে অসচেতনভাবে, বেড়ে ওঠার অংশ হিসেবে। ওই ভাষায় পড়াশোনা যখন শুরু হয়, তখন সে ভাষাটির ব্যাপারে সচেতন হয়। বলা যায়, ভাষাটি সে লেখার ভাষা হিসেবে সচেতনভাবে রপ্ত করতে থাকে। পড়াশোনার ভাষা যেখানে বাংলা নয়, সেখানে লিখিত ভাষায় কেউ একজন পারঙ্গমতা দেখাবে, এমন চিন্তা হাস্যকর। তদুপরি সমাজে একথা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে যে, বাংলা ভাষা অন্য কোনো কাজে তো নয়ই, এমনকি শিক্ষার কাজেও অপারগ। এমতাবস্থায় লোকে যদি ইংরেজি রপ্ত করার চেষ্টা করে, আর কথাবার্তা সে ভাষাতেই বলতে চায়, তাহলে তাকে দোষ দেয়া যায় না। এরকম পরিস্থিতিতে যে ভাষা-মিশ্রণ খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে, দুনিয়ার সর্বত্র ভাষাশাস্ত্রীরা তা বাস্তব তথ্য-উপাত্ত থেকে বহুবার দেখিয়েছেন। অর্থাৎ, বাংলাদেশে বাংলা ভাষার যে দুই সমস্যা নিয়ে আমাদের ভদ্রলোকেরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন, তা আসলে অন্য অবস্থার স্বাভাবিক ফল। যদি তাঁদের উদ্বেগ আসল হতো, তাহলে তাঁরা কথা বলতেন শিক্ষার ভাষা নিয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক নানা কাজে ভাষা-ব্যবহারের বাস্তবতা ও ফল নিয়ে। তা না করায় তাঁদের উদ্বেগ নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না।

প্রশ্ন হলো, লোকে এই অকাজের উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন? প্রথম কারণ অজ্ঞতা। ভাষা যে বদলে যায়, আর নতুন রূপগুলো খুব ধীরে-সুস্থে মানভাষায় স্থান করে নিতে থাকে, অধিকাংশ মানুষ সে হদিস রাখে না। সে ছোটোবেলায় ভাষার যে রূপে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল তাকেই চিরন্তন রূপ মনে করে। ফলে উদ্বিগ্ন হয়। একে এক ধরনের অজ্ঞতাই বলতে হবে। অন্যদিকে, ভাষা-মিশ্রণকে লোকে খারাপ চোখে দেখে এ চিন্তা থেকে যে, ভাষার একটি 'শুদ্ধ' রূপ আছে, আর মিশ্রণের ফলে ওই শুদ্ধরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভাষার এই শুদ্ধতার ধারণাও একটা কুসংস্কার। আদতে কোনো ভাষাই শুদ্ধ নয়, অশুদ্ধও নয়। ভাষামাত্রই মিশ্র। ফলে ভাষামিশ্রণ ভাষার অস্তিত্বের মতো স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলায় ইংরেজি বেশি মিশছে বাংলাদেশের বিশেষ ভাষা-পরিস্থিতির কারণে, যে কথা আগেই বলেছি। মুখের ভাষা নিয়ে উদ্বেগ অকারণ ও অর্থহীন। এদিকটা দুনিয়ার যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই খাটে – কোথাও কম কোথাও বেশি। এগুলো নকল উদ্বেগ তো বটেই।

তাহলে আসল উদ্বেগ কোনটা? ভাষা সম্পর্কে প্রকৃত উদ্বেগ ও তৎপরতা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত; রাষ্ট্রের সাথে জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের সাথে যুক্ত; জনসাধারণের ভবিষ্যৎ গড়ার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাথে যুক্ত। বাংলাদেশে বাংলা ভাষা নিয়ে কাজের আলাপ যে এখনো শুরুই হয়নি, তার কারণ, আমরা রাষ্ট্রগড়ার আলাপটা এ পর্যায়ে উন্নীত করতে পারিনি। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বলা যাক। আমরা যে বাংলাদেশে ইংরেজি নিয়ে পরম আবেগ বোধ করি তার অন্তর্গত কারণ যাই হোক প্রকাশ্য প্রধান যুক্তিটি তো উন্নয়ন বা উন্নতি। কিন্তু সিঙ্গাপুরের মতো দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া দুনিয়ায় এমন দেশ বিরল যাদেরকে লোকে উন্নত দেশ বা জনগোষ্ঠী নামে চেনে, এবং তারা উন্নতিটা করেছে দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহার করে। তাদের নিজেদের ভাষার শিক্ষা তো তাদের দেশের উন্নয়নও ঠেকাচ্ছে না, আবার বিদেশে মর্যাদার সাথে ব্যাপক হারে অভিবাসী হওয়াও ঠেকাচ্ছে না। যে ভাষা দরকারে শেখার প্রয়োজন হচ্ছে, তা সে ইংরেজিই হোক আর অন্য যে ভাষাই হোক, তা তারা পদ্ধতিমাফিক শিখে নিচ্ছে। তাহলে আমাদের এখানে এমন ভাবনা কীভাবে এত জনপ্রিয় হলো, যা দুনিয়ার কোথাও নেই?

এ ব্যাপার নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়াই আসলে বাংলা ভাষা নিয়ে প্রকৃত উদ্বেগ। যদি রাষ্ট্র গঠন করতে হয়, যদি জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পিত শিক্ষার মধ্য দিয়ে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হয় – বিস্তর টাকা খরচ করে যাদের ইংরেজি শেখার ক্ষমতা আছে কেবল তাদের নয়, দেশের সমস্ত মানুষের; যদি বিদেশে সন্তানদের পাঠিয়ে 'সেটেল্ড' করাই জীবনের পরম লক্ষ্য না হয়ে 'শিক্ষা'টা লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তাহলে আলাপ শুরু হবে বাংলা ভাষা নিয়ে। তখন আমরা বুঝতে পারব, ভাষার শুদ্ধতা-রক্ষা এবং ভাষা-মিশ্রণের আলাপ কেবল উপরিতলের ফেনাই নয়, বিনোদনমূলক ফানি আলাপও বটে।

৩

কোনো জাতিরাষ্ট্রের ভাষা গভীর সংকটে পড়ে তখনই যখন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক বা বুনিয়াদি জায়গাগুলোতে তার ঠাঁই হয় না। এরকম ক্ষেত্র মূলত তিনটি: দাপ্তরিক ব্যবহার, আইনি ব্যবহার এবং শিক্ষায় ব্যবহার। বাংলাদেশের অভিজাত দপ্তরগুলোতে বাংলার ব্যবহার বেশ কোণঠাসা; আদালতের কুলীন প্রাঙ্গণে বাংলার ব্যবহার এতই অচেনা যে কেউ একজন বাংলায় রায় লিখলে রীতিমতো প্রকাশযোগ্য সংবাদ হয়ে ওঠে; আর শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা যায়, সচ্ছল মধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েরাও আজকাল আর বাংলা মাধ্যমে পড়ছে না। এই শেষেরটিই অধিকতর বিপর্যয়কর; কারণ, এর মধ্য দিয়েই গড়ে উঠছে সেই জনগোষ্ঠী যারা অন্য দুই প্রাঙ্গণে বাংলা ব্যবহারের এমনকি চিন্তাও করবে না।

উচ্চশিক্ষায় বাংলার অবস্থা আসলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যথার্থ আয়না। আপনি বলতে পারেন, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় বাংলা আছে – অন্তত আংশিকভাবে; সংখ্যা হিসাব করে এমনকি এও বলা যাবে, অধিকাংশ ছেলেমেয়েই বাংলা মাধ্যমে পড়ছে। শিক্ষার মাধ্যম বলতে আমরা বুঝব শ্রেণিকক্ষের ভাষা, উত্তরপত্রের ভাষা এবং পাঠ্যপুস্তকের ভাষা। সেদিক থেকে আমাদের এখানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এবং মেডিকেলে কখনোই বাংলা ছিল না। যেমন ছিল না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দশক আগেও বেশির ভাগ বিভাগে বাংলায় পরীক্ষা দেওয়া যেত; এখনো পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলায় উত্তর লেখাকে বেশ নিরুৎসাহিত করা হয়। ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পড়েছে থেকেও না থাকার সংকটে। এ বাস্তবতা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন না হলে আসলে কোনো আলাপই কাজের দিক থেকে জমবে না।

উচ্চশিক্ষার এই পরিস্থিতিটা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করছে। বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে দক্ষতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে সুবিধা করতে পারছে না – এরকম একটা যুক্তিই আসলে আগে থেকেই ইংরেজি অবলম্বনের ন্যায্যতা তৈরি করে। বাংলাদেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণি আগে থেকেই ইংরেজি মাধ্যমে পড়ত। প্রায় দুই দশক হয়ে এল, শিশু শ্রেণি থেকেই ইংলিশ ভার্সন চালু করেছে সরকার। ফলে বাংলা মাধ্যমে পড়ে কেবল তারা, যারা ইংরেজি কিনতে পারে না।

প্রশ্ন হলো, এ অবস্থা অনেকদিন ধরে কীভাবে চলছে, এবং কেন মনে হচ্ছে যে এতেই আমাদের কাজ চলছে। যে কথাটার উপর জোর দিতে চাই তা হলো, দুনিয়ায় এমন দেশ খুব বিরল, যারা অন্য ভাষায় শিখিয়ে উন্নতি করেছে। শুধু ভারতের কথা বলা যায়, যদিও ভারতের ভাষাপরিস্থিতি বাংলাদেশের ভাষাপরিস্থিতির সাথে একবিন্দুও মেলে না। যারা এ তুলনাটা করেন বা উদাহরণটা দেন, তারা ভুল উদাহরণ দেন; কিন্তু বাংলাদেশে এই আলাপে সাধারণত ভারতের কথাই উচ্চারিত হয়, তার কারণ অন্য উদাহরণ খুব সুলভ নয়। তাহলে এই যে বাংলাদেশে ইংরেজিটা চলছে – খুব ভালোভাবে চলছে তা নয় – এটা চলতে পারছে কেন? চলতে পারার কারণ – সোজা বাংলায় – আমরা আসলে শিক্ষাটা দিচ্ছি না।

কিন্তু এ কথারই বা অর্থ কী? শিক্ষা নাই মানে কী? তাহলে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা করিটা কী? আমরা আসলে শিক্ষার নামে কিছু স্কিল সরবরাহ করি। স্কিল দিয়ে যে কাজ চলে আমরা ঠিক সে কাজই করছি। ইউজিসির বিশ-বছর-মেয়াদি কৌশলপত্রে এ কথাই বলা হয়েছে, এ উদ্দেশ্যের কথাই বলেছে। ওই কৌশলপত্রে শিক্ষার মাধ্যমের কথা একেবারেই আনা হয়নি। তার কারণ, তারা ধরে নিয়েছে, মাধ্যমটা ইংরেজি হয়েই আছে। আর ওই কৌশলপত্রে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ করা।

তাহলে আমরা আমাদের উচ্চশিক্ষা-যে চলছে বলে মনে করছি, তার প্রধান কারণ হলো, আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী সরবরাহ করছি, অথবা একেই প্রধান লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করছি। কাজটা অবশ্য খুব ভালোভাবে হচ্ছে না। সাধারণত দুনিয়ার শ্রমবাজারে প্রবেশের আগে আমাদের শিক্ষার্থীদের উন্নত দেশ থেকে আরেকটা ডিগ্রি নিয়ে নিজেদের যোগ্য করে তুলতে হয়। আর দেশের অভ্যন্তরেও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো লোক তৈরি করছে প্রধানত সেবাখাতের জন্য। কাজটাকে সরল করে বলা যায় পণ্য বিক্রির কাজ। এ দুটোই – দেশীয় সেবাখাতে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কর্মী সরবরাহ – আমাদের মূল লক্ষ্য বলে ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষায় কাজ চলে। এটা কোনো 'এজুকেশন' নয়, বড়োজোর টেনেটুনে 'ইনস্ট্রাকশন'।

উল্লেখ করা দরকার, আমাদের রাষ্ট্র আমাদের জ্ঞানে চলে না। বাংলাদেশে এমন কোনো শিক্ষাব্যবস্থা নেই যা রাষ্ট্র চালানোর মতো জ্ঞান তৈরি করবে। রাষ্ট্র চালানোর জন্য যাবতীয় প্রযুক্তি আমরা বিদেশ থেকে ধার করি। ফলে আমাদের-যে 'শিক্ষা' নাই, তার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হয় না। আরেকটা সত্য এই যে, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত পরিবারের বিপুল অধিকাংশ ছেলেমেয়ে মনে করে, বাংলাদেশে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। যেতে হবে বিদেশে। ফলে ইংরেজি মাধ্যমে পড়লে কাজটা একটু এগিয়ে রাখা যায়।

এসব কারণে মনে হচ্ছে, আমাদের ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা ভালোই চলছে। কিন্তু আসলে শিক্ষার বদলে আমরা শিখছি 'মাধ্যম'। অর্থাৎ, ইংরেজিটাই শেখানো হচ্ছে, ইংরেজির মাধ্যমে কোনো 'বিষয়' নয়। ফলে কাজ চলছে। বিদেশে এবং দেশে সার্ভিস সেক্টরে। কিন্তু এ অবস্থা আসলে চলতে পারে না। আমাদের পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে, দেশের আর্থিক অবস্থা ভালো হচ্ছে। আমাদের শিক্ষা দরকার। বস্তুত কর্পোরেট অফিসগুলো চালানোর মতো প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরি হয়ে উঠছে না।

যদি আমরা গুণসম্পন্ন শিক্ষা চাই, যদি জ্ঞান-উৎপাদক শিক্ষা চাই, যদি এমন শিক্ষা চাই যেখানে আমাদের উচ্চশিক্ষায় উৎপাদিত স্নাতকরা কার্যকরভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র চালাবেন, তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে পালটাতে হবে। অনেকগুলো বড়ো পরিবর্তন করতে হবে। সেই পরিবর্তনের প্রথমটি হবে, সম্ভবত, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। বাংলায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য, এখনকার বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার দিকে অল্প অল্প করে এগোতে হবে। কারণ, যেমনটি আগেই বলেছি, শিক্ষায় বাংলা আসলে নেই। নেই বলেই কোনো বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিলে ভোক্তাস্তরে সম্মতি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ধীরে ধীরে সামাজিক সম্মতি তৈরি করতে হবে; একই সাথে বাংলাকে উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যাবহারিক দিক থেকে প্রস্তুত করার কাজটাও সমানতালে চলবে।

কী কী উদ্যোগ নিতে হবে? বাংলা এবং ইংরেজিকে পরস্পরের বৈপরীত্যে স্থাপন করে আমাদের এখানে একটা সামাজিক কুসংস্কার জোরালোভাবে জেঁকে বসে আছে, সেটা দূর করা হলো প্রধান কাজ। আমাদের প্রত্যেক সক্ষম বাবা-মা আসলে এটাই মনে করেন। এটা একটা সামাজিক কুসংস্কার, এবং এর নিরসন ব্যক্তির কাজ নয়। ব্যক্তি যে কোনো কিছু মনে করতে পারে, এবং তার প্রতি গণতান্ত্রিক কায়দায় শ্রদ্ধাশীল থাকতে রাষ্ট্র বাধ্য। রাষ্ট্রকেই নানাবিধ বাস্তব তৎপরতা নিয়ে বোঝানোর কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে যে দুটি ভাষা কার্যক্ষেত্রে পাশাপাশি চলতে পারে। সারা পৃথিবীর মানুষ যে দ্বিতীয়-তৃতীয় ভাষা শেখে, দ্বিতীয়-তৃতীয় ভাষার এমনকি সৃজনশীল বা জ্ঞানজাগতিক ব্যবহার করে, এই বাস্তবতাটা সামনে আনতে হবে। বাংলাদেশের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতায় এটাই হবে প্রথম কাজ।

দ্বিতীয়ত, পাঠ্যপুস্তক তৈরি হবে এবং পরিভাষা তৈরি হবে – এজন্য একদিনও অপেক্ষা না করে উচ্চস্তরে বাংলা ব্যবহার শুরু করতে হবে। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, পরিভাষা আসলে বাংলা বা ইংরেজির বিষয় নয়। আমাদের শিক্ষাজগতের লোকজনের মধ্যেও এ বোধ খুবই দুর্লভ। আসলে পরিভাষা সংশ্লিষ্ট বিষয় বা ডিসিপ্লিনের ব্যাপার। আর পরিভাষা তৈরি করবে সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের চর্চাকারীরা, একেবারেই তাদের চর্চার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কাজেই পরিভাষা এবং ভাষার জন্য একবিন্দু সময় ব্যয় না করে শুরু করতে হবে আজই, আংশিকভাবে, যেহেতু হঠাৎ করে পুরোটা বাংলায় প্রবর্তন করা এখনই সম্ভব নয়। ক্রমাগত বাড়িয়ে, অল্পদিনের মধ্যে আমাদের এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছাতে হবে, প্রাইভেট এবং পাবলিক সর্বত্র, যেখানে উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীরা বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষায় লিখতে, পড়তে, এবং পরীক্ষায় উত্তর দিতে পারবে। শুধু বিদেশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন ছেলে-মেয়ে এবং বাঙালি বা বাংলাভাষী নয়, এমন শিক্ষার্থীদের এ প্রকল্পের বাইরে রাখা যেতে পারে। এর বাইরে বাঙালি বাবামায়ের ছেলে-মেয়ে, যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রে জন্মেছে এবং বড়ো হয়েছে, এদের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উচ্চশিক্ষায় বাংলা এবং ইংরেজিকে কার্যকরভাবে একসঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আগামী অনেক দিন পর্যন্ত, যতদিন পর্যন্ত না আমরা বাংলাকে সরাসরি এককভাবে নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করি। ফলে, আপাতত আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, উচ্চশিক্ষা শেষে আমাদের ছেলে-মেয়েরা যেন দ্বিভাষিক দক্ষতা অর্জন করে।

তৃতীয় ধাপে যেতে হবে আরও অনেকদূর। আমরা যদি সত্যিই উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে চাই তাহলে আমাদের ঢুকতে হবে গবেষণাস্তরে, আর সেই গবেষণাটা করতে হবে বাংলায়। এখানে আর একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি : সত্যেন বোস প্রমুখ বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা করেছেন বলে একটা কথা খুব চালু আছে। কথাটা ঠিক নয়। তাঁরা যেটা করেছেন তাকে বলতে পারি, বাংলায় বিজ্ঞানরস পরিবেশন করা। এটা অন্য ধরনের সাহিত্য মাত্র। একটা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা আর বিজ্ঞানরস পরিবেশন সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা অ্যাকাডেমিক অর্থে কখনোই হয়নি। বিজ্ঞানীরা কখনো কখনো নিজেদের বা অন্যদের গবেষণার ফল সরলভাবে জনগণের জন্য প্রচার করেছেন। এটাকেই আমরা ভুলভাবে বলেছি বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা। সত্যিকার বিজ্ঞানচর্চায় – এবং কলা, বাণিজ্য ও সমাজবিজ্ঞানেও – বাংলা ব্যবহারের জন্য উচ্চডিগ্রির সন্দর্ভে বাংলা আবশ্যিক করতে হবে। ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা এবং বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতে সন্দর্ভ রচনা নিশ্চিত করতে হবে। কেবল যথেষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ নিশ্চিত করেই এটা করা সম্ভব। গবেষণা-সন্দর্ভ বাংলায় না লিখলে বাংলা ভাষার সেই আভিজাত্য এবং কার্যকরতা কখনোই সম্ভব নয়, যে আভিজাত্যের চাপে উচ্চ থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত শিক্ষামাধ্যমের বাজে আলাপ চিরতরে নির্মূল হবে।

৪

বাংলাদেশের উচ্চশ্রেণি থেকে নিম্নমধ্যবিত্ত পর্যন্ত ইংরেজির প্রবল প্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মুখ্যত 'উন্নতি'র মোহে। এটা অবশ্য কমবেশি সারা দুনিয়ারই বাস্তবতা। কিন্তু যে দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়, অর্থাৎ যারা আসলেই উন্নতি করেছে, তাদের সাথে আমাদের একটা গোড়ার ফারাক আছে। ওসব দেশে ব্যক্তি, পরিবার বা দলের 'মোহ' জাতীয় শিক্ষানীতি বা ব্যবস্থার চালক হয়ে ওঠে না। জাতীয় ভাষা জাতীয় শিক্ষার মূল বাহন থাকে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা শেখার পর্যাপ্ত বন্দোবস্তও রাষ্ট্র করে। আমাদের হয়েছে উল্টা। এখানে স্রেফ ইংরেজি শেখার জন্য প্রথম ভাষাটিকে ভুলিয়ে দেয়ার কায়দা-কানুন করা হয়। সারা দুনিয়াতেই প্রথম ভাষায় শিক্ষার পাশাপাশি আবশ্যিকভাবে ছাত্রছাত্রীরা দ্বিতীয়-তৃতীয় ভাষা দেদার শিখছে। আমরা ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য খোদ শিক্ষাকেই বিসর্জন দিচ্ছি।

ঠিক এখানেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বরাত বা দোহাই হয়ে উঠেছে। সেটা সম্ভব হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারির এক সর্বব্যাপ্ত সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে। একুশের কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস, আর তার প্রায়োগিক বাস্তবতা কয়েক দশক ধরে এক অন্যরকম মূর্তি পেয়েছে ফেব্রুয়ারির বইমেলাকে ঘিরে। আমাদের বইমেলা এতটা জমজমাট হওয়ার পেছনে অন্তত মধ্যবিত্তের সামষ্টিক মনস্তত্ত্বে তৈরি হওয়া একুশ প্রীতির বড়ো ভূমিকা আছে বলেই মনে হয়। আমাদের জনমানসে এবং কেতাবি ভাষায় ফেব্রুয়ারি হয়ে উঠেছে ভাষার মাস। এই ভাষা বাংলা ভাষা। ফলে গণমাধ্যমগুলোর বৃহৎ পরিসরে বাংলা ভাষা নিয়ে আলাপ-আলোচনার একটা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যও তৈরি হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে। বহুদিন হলো, 'গণতান্ত্রিক' ও 'উন্নত' বাংলাদেশ গড়ার তাত্ত্বিক-প্রায়োগিক আলাপও ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে উপস্থাপন করার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার প্রথম ধাপ হলো, শিক্ষাসহ জনপরিসরের যে কোনো ক্ষেত্রে জনগণের ভাষা ব্যবহার করা। অল্পকিছু মানুষ রপ্ত করতে পেরেছে, এমন ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিপুল মানুষ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা অপরায়ণের শিকার হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা ও রাষ্ট্রের অবস্থা পর্যালোচনার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তাতে ভর করে রাষ্ট্রগঠনের জরুরি আলাপগুলো ওঠানোর বড়ো সুযোগ তৈরি হয়েছে।

সর্বস্তরে বাংলা চালুর জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারির দোহাই মোটেই যথেষ্ট নয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য ভাষাকেন্দ্রিক জরুরি ও উপযোগী আলাপগুলো তোলার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তাকে কাজে লাগিয়ে কার্যকর আলাপ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। সেটাই হয়ত হয়ে উঠবে আমাদের গণতন্ত্র ও উন্নতির জরুরি সোপান। ❑

লেখক : মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

বাংলা আমার ভাষা

আবদুল হাই শিকদার

পাখিকে কে উড়াল শেখায়
নদীকে পথ হাঁটা,
ফুল পাহারায় থাকবে জেগে
বনের যত কাঁটা।

কে শেখালো বিড়ালছানা
দুগ্ধ কোথায় থাকে,
পাখিরা কেন দিন-রাত্তির
অষ্টপ্রহর ডাকে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে
সমুদ্রে সর পড়ে?
নীলের কলস কাৎ হয়ে যায়
আকাশ সরোবরে।

তারার মিছিল রাত্রি হলে,
দিবস ভরা আলো,
সূর্য এদিক সেদিক হলেই
সাদা এবং কালো।
ভালো এবং মন্দ ঘেষা
পথ নয় মসৃণ-
বুকের রক্ত উজাড় করে
বানাতে হয় দিন।

অন্যায্যকে অন্যায্য কও
জুলুমকে কও হটো,
মায়ের মুখের হাসির জন্য
মিছিল নিয়ে ছোটো।
মশাল জ্বালো স্বাধীনতার
বাগান করো ফুলের,
দেশের জন্য প্রাণ বলিদান
সত্যিকারের সুখের।

কে শেখালো নকশি কাঁথা
স্নিগ্ধ আদর দান?
মানুষ ভালোবাসার গানে
ভরালো ময়দান?
শূন্য বুকে আয় ফিরে তুই
কে জাগালো আশা?
এক কথাতেই জবাব মেলে
বাংলা আমার ভাষা।

আমার ভাষা লালন ফকির,
আমার ভাষা নদী,
আমার ভাষা সুখ ও দুঃখের
জীবন নিরবধি।
সমতা আর মমতাময়
হৃদয় করে জারি,
আমার ভাষা ভুবনজয়ী
সূর্য দীঘল বাড়ি।

ডিএফপি নং. ১১/২০.০২.২০২৫